#আমি পদ্মজা পর্ব ১৮

_____

ভীর কমতেই কানে তালা লাগা প্রচন্ড শব্দে বজ্রপাত হয়। হেমলতা একা পদ্মজাকে তুলতে গিয়ে হিমশিম খান। মোর্শেদ এগিয়ে আসেন। দুই হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেন পদ্মজাকে। বিজলি চমকাল। বিজলির আলোয় পদ্মজার মুখটা দেখে মোর্শেদের বুক কেমন করে উঠল! কষ্টে বুক চুরমার হয়ে গেল। জন্মের দিন পদ্মজাকে কোলে নেয়ার পর যে অনুভূতিটুকু হয়েছিল ঠিক সেরকম একটা অনুভূতি হয়। অনুভূতিটুকুর

নাম বোধহয় পিতৃত্ব! প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইছে। তারা ঘরে ঢুকতেই ভারী বর্ষণ শুরু হলো। মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব দেখা দিল! তবে সেই তাণ্ডব ছুঁতে পারল না মোড়ল বাড়ির মানুষদের মন। ঝড়ের তান্ডবের চেয়েও বড় তান্ডবের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে তারা। হেমলতা গরম পানি করে পদ্মজাকে গোসল করালেন। জামাকাপড় পাল্টে দিলেন। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে নীরবে কেঁদে গেল। চোখের জল আটকে রাখতে পারছে না কিছুতেই। ইচ্ছে হচ্ছে বাড়ির পিছনের সবচেয়ে বড় আম গাছটার সাথে ফাঁস লেগে মরে যেতে। মন দূর্বলতার শূন্য

ছুঁই ছুঁই। হেমলতা পদ্মজার চুল মুছে কপালে চুমু দিলেন। পদ্মজার নাকে এক ফোঁটা জল পড়ল। পদ্মজা চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল।

‘আম্মা আসছে? আমার আম্মা কই? আম্মা আসে নাই?’

পাশের ঘর থেকে পূর্ণার চিৎকার ভেসে আসল। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে পূর্ণা ছুটে এলো। হেমলতাকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল হেমলতার বুকে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। পূর্ণার শরীর আগ্নেয়গিরি মনে হচ্ছে। এতো গরম! জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজাও ডুকরে কেঁদে উঠল।

হেমলতা স্তব্ধ হয়ে দুই মেয়ের কান্না শুনলেন। সামলানোর চেষ্টা করলেন না। মনজুরা দরজার সামনে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। টিনের চালে ভারী বর্ষণের শব্দ। জগৎসংসার সেই শব্দে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

মাঝরাত। বাতাসের বেগ প্রচন্ড। হেমলতা কালো রংয়ের শাড়ি পরে, একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ান। মনজুরা বারান্দার ঘর থেকে উঁচু কণ্ঠে বলেন,'রাম দা ব্যাগে ক্যান ঢুকাইছস? আর কোন কেলাঙ্কারি বাকি?'

হেমলতা বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়ালেন। পলকমাত্র মনজুরার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে,নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বর্ষণ মাথায় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনজুরা শুষ্ক হয়ে উঠলেন। ছুটে পদ্মজার ঘরে গেলেন। পদ্মজা চুপচাপ শুয়ে আছে। মৃদু ফোঁপানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ণা ঘুমাচ্ছে। তিনি এ ঘর ছেড়ে দ্রুত বারান্দার ঘরে আসলেন। বড্ড অস্থির লাগছে। জীবনে প্রথম হেমলতার জীবন ভিক্ষা চেয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন!

_____

ফজরের আযান শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। সবকিছু শান্ত। পদ্মজা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসল। গেইটে শব্দ পেয়ে চমকে তাকাল। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল। হেমলতা ঢুকেন। বিধ্বস্ত অবস্থা। মনজুরা পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পদ্মজা টের পেল না। হেমলতা বাড়িতে ঢুকে কাঁধের ব্যাগটা মুরগির খুপীর সামনে ছুঁড়ে ফেলেন। অন্ধকারের জন্য মুখ স্পষ্ট নয়। হেমলতা বাড়ির পিছনের দিকে চলে গেলেন। পদ্মজার বুক দুরুদুরু করছে। সে ধীর পায়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। পিছনে মনজুরা। পায়ের শব্দে চমকে

তাকাল পদ্মজা, দেখতে পেল মনজুরাকে। ফিসফিসিয়ে বলল,'নানু,আম্মা কোথায় গিয়েছিল?'

মনজুরা ক্ষণকাল নীরব থেকে এরপর বললেন,'জানি না।'

মনজুরার কণ্ঠে ভয়। পদ্মজা দূর্বল শরীর ঠেলে নিয়ে আসল বাড়ির পিছন। দেখতে পেল,হেমলতা নদীতে নেমে গোসল করছেন। এক নিঃশ্বাসে কয়েকটা ডুব দিলেন। পদ্মজা ব্যস্ত পায়ে ঘাটের কাছে এলো। ক্ষীণ স্বরে ডাকল,'আম্মা।'

হেমলতা ঘুরে তাকালেন। ঝড় শেষে আকাশ ধবধবে সাদা । অন্ধকার কাটার পথে। পদ্মজা বলল,'ঠান্ডা লাগবে।'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। গোসল শেষ করে উঠে আসেন উপরে। পদ্মজা আর কিছু বলল না। হেমলতা উঠানে এসে মনজুরাকে বললেন,'পূর্ণারে নিয়ে আসো আম্মা।'

পদ্মজা অবাক হয়ে শুধু দেখছে। পূর্ণা আসে ধীর পায়ে হেঁটে। তার জ্বর অনেকটা কমে এসেছে। মনজুরা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। হেমলতা মৃদু হেসে পূর্ণাকে বললেন,'পদ্মজা পাশে এসে দাঁড়া।'

পূর্ণা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। সে বাধ্যের মতো পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। হেমলতা মুরগির খুপীর পাশ থেকে কালো ব্যাগটা হাতে তুলে নিলেন। ব্যাগ থেকে একটা রাম দা আর একটা কৌটা বের করলেন। পূর্ণা রাম দা দেখে চমকে উঠল। দু'বোন চাওয়াচাওয়ি করল একবার। হেমলতা রক্তেমাখা রাম দা দুই মেয়ের পায়ের সামনে রাখলেন। শীতল কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন,'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আর পৃথিবীতে সেরা মানুষগুলোরই বাঁচার অধিকার আছে। মানুষরূপী পশুদের না। যখন যেখানে কোনো মেয়েকে অসম্মান হতে দেখবি এক কোপ দিয়ে

অমানুষটার আত্মা দেহ থেকে আলাদা করে দিবি। যে তোকে অসম্মান করেছে সে দোষী, তুই না। তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ, তোর না। তাই আত্মহত্যার কথা কখনো ভাববি না। দোষীর আত্মা হত্যা করা উচিৎ। আর আমি মনে করি, এতে পাপ নেই। বরং পাপীকে বিনাশ না করা পাপ। আর আমার মেয়েরা যেন সেই পাপ কখনো না করে। সেই....”

‘মেয়েদের এসব কি শিক্ষা দিতাছস তুই? মাথা খারাপ হইয়া গেছে তোর?’

মনজুরা হইহই করে উঠলেন। হেমলতা ঢোক গিলে মনজুরার কথা হজম করে নিলেন। এরপর আবার

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন,’ আমি কখনো ছেলে চাইনি। মেয়ে চেয়েছি। প্রতিবাদী, দুঃসাহসীক মেয়ে চেয়েছি। আল্লাহ আমাকে তিনটা মেয়ে দিয়েছেন।
এখন সেই মেয়েরা যদি এইটুকুতে দূর্বল হয়ে পড়ে কীভাবে হবে? ঠিক আগের মতোই মাথা উঁচু করে বাঁচবি। যতদিন আমি আছি কেউ তোদের অসম্মান করে টিকতে পারবে না। আমি না হয় যতদিন বেঁচে থাকি তাদের শাস্তি দেব। পৃথিবী থেকে মুছে দেব। কিন্তু যখন থাকব না? তখন,তখন কী তারা বেঁচে থাকবে? বেঁচে থাকতে দেয়া ঠিক হবে? অন্য কোনো মেয়ের সাথে নোংরামো

করবে না তার নিশ্চয়তা আছে? নেই। এখন থেকে নিজেদের শক্ত কর। মেয়েদের সাহস মেয়েদরই হতে হয়। নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের। রাতের স্মৃতি দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে বলব না। মনে রাখ। প্রতিটি মানুষের ভেতর লুকানো হিংস্র শক্তি আছে। সবাই প্রকাশ করতে জানে না। চিনতে পারে না নিজেকে। গত রাতের ঘটনাটা মনে রেখে নিজের ভেতর লুকানো হিংস্র শক্তিটাকে জাগিয়ে হাতের মুঠোয় রাখ। যাতে সঠিক সময়ে হাতের মুঠো খুলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারিস। আঘাতে, আঘাতে

চুরমার করে দিতে পারিস পাপের জগত।”

এইটুকু বলে হেমলতা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দপ করে বসে পড়েন। পদ্মজা ‘আম্মা’ বলে হেমলতাকে ধরতে চাইলে, হেমলতা হাত উঠিয়ে বলেন,’দাঁড়িয়ে থাক।’

হেমলতা সময় নিয়ে দম নেন। এরপর কৌটাটা খুলে ঠান্ডা তরল কিছু ঢেলে দেন দুই মেয়ের পায়ে। পূর্ণা কেঁপে উঠে দূরে সরে গেল। পদ্মজা আতঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন করল,’আম্মা, কার রক্ত?’

রক্তের কথা শুনে ঘৃণা আর ভয়ে পূর্ণার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। মনে

হচ্ছে,পায়ে পোকা কিলবিল করছে। টাটকা তাজা লাল রক্ত! বমি গলায় এসে আটকে গেছে। হেমলতা পদ্মজাকে জবাব দিলেন না। শুধু মৃদু হাসলেন। পূর্ণা এই ভয়ংকর দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারাল। পদ্মজা দু'হাতে জাপটে ধরল পূর্ণাকে। কী আশ্চর্য, এই ভয়ংকর ঘটনা তাকে একটুও বিচলিত করল না! হেমলতার গায়ে ভেজা শাড়ি। তাই পূর্ণাকে ধরলেন না। মনজুরাকে বললেন,'পূর্ণারে ঘরে নিয়ে যাও, আম্মা।'

মনজুরা কঠোর চোখে তাকান হেমলতার দিকে। হেমলতা আবারো হাসেন। ভেজা কণ্ঠে বলেন,’কালো বলে অবহেলা না করে বুকে আগলে রাখলে আমার জীবনটা, আমার মেয়েদের জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো আম্মা।”

হেমলতার কথায় মনজুরার সারামুখ বিষণ্নতা ছেয়ে গেল। তিনি হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। অপরাধবোধে মাথা নুইয়ে ফেললেন। পূর্ণাকে ধরে নিয়ে গেলেন ঘরে। হেমলতা সেখানেই পড়ে রইলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে জোরে

নিঃশ্বাস ফেললেন। আলো ফুটেছে পুরোপুরি। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। পানি দিয়ে উঠানের রক্ত মুছে দিলেন চিরতরে। রাম দা ধুয়ে লুকিয়ে রাখলেন লাহাড়ি ঘরে। শাড়ি পাল্টে উঠানে পা রাখেন। তখন মগা আসল। এসে খবর দিল, বিচার বসবে দুপুরে। রাতের ঘূর্ণিঝড়ে গ্রামের বেশিরভাগ ঘরবাড়ি উড়ে গেছে। পশুপাখি সহ বিভিন্ন ক্ষতি হয়েছে। অনেক মানুষ আহত হয়েছে! এই খবর শুনে হেমলতার চোখ সজল হয়ে উঠল। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। প্রকৃতি কখনো কাউকে ছাড়ে না! গ্রামবাসী অন্যায়

দেখেও নিস্তব্ধ থেকেছিল। এ বুঝি তারই শাস্তি!

_____

মাথার উপর সূর্য। প্রচন্ড তাপদাহ । পূর্ণা,পদ্মজা, হেমলতা কালো বোরখার আবরণে নিজেদের ঢেকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে অলন্দপুরের মাধ্যমিক স্কুলের উদ্দেশ্যে। খাঁ খাঁ রোদ্দুর, তপ্ত বাতাসের আগুনের হলকা । সবুজ পাতা নেতিয়ে পড়ার দৃশ্য পড়ছে চোখে। মোর্শেদ বাকিদের নিয়ে আসছে। রীনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে করুণ কান্নার স্বর ভেসে আসে। পদ্মজা চোখ তুলে তাকিয়ে

দেখল,রীনার বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে। গাছপালা ভেঙ্গে উঠানে পড়ে আছে। হেমলতা পদ্মজাকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যান।

বটের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছিল এক রাখাল ছেলে। সে হেমলতার মুখ দেখে বুঝল, পিছনের দুটি মেয়ে পদ্মজা আর পূর্ণা। ছুটে আসল। পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে বলল,'পদ্ম আপা তুমি ডরাইও না। তোমার কিচ্ছু হইব না।'

চারদিকে নিঝুম , নিস্তব্ধ,ঝিমধরা প্রকৃতি । ঘামে দরদর তৃষ্ণার্ত রাখাল। হাঁপিয়ে কথা বলছে। স্কুলে যাওয়ার পথে, মাঝে মাঝেই এই পনেরো বছর

রাখালের সাথে দেখা হতো পদ্মজার। পদ্মজার জন্য পাগল সে। বড় বোনের মতো মান্য করে। পদ্মজা মৃদু করে হাসল। পদ্মজার মুখের উপর পাতলা পর্দা বলে, রাখালের চোখে তা পড়ল না। রাখালকে পিছনে ফেলে তিন মা মেয়ে এগিয়ে চলল।

স্কুল মাঠে অনেক মানুষ জমেছে। রাতের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অলন্দপুরের বেশি অর্ধেক মানুষ আসেনি। তবুও প্রায় পাঁচ'শ মানুষ তো এসেছেই! ঘটনা ঘটেছে আটপাড়ায় আর তা ছড়িয়ে পড়েছে সব পাড়ায়! যথাসময়ে বিচার কার্য শুরু হলো। পদ্মজা এবং আমির

দুজন দু'দিকে দাঁড়ানো। মাতব্বর ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন,'এদের একসাথে কারা দেখেছেন?'
রমিজ আলী,কামরুল, মালেক হাত তুলল। মজিদ মাতব্বর বললেন,'কী দেখেছেন? ব্যাখ্যা করুন।'
রমিজ আগে আগে উঁচু কণ্ঠে বলল,'আমি দেখছি ঝড়ের সন্ধ্যায় আপনের পোলারে পদ্মজার ঘর থেকে বাইর হইতে। বাড়িত আর কেউ আছিলো না।'

আমির রেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইল, মজিদ মাতব্বর হাতের ইশারায় আটকে দিলেন। আমির বাপের বাধ্য

সন্তান তাই থেমে গেল। মজিদ মাতব্বর বললেন,’আপনি আমিরকে পদ্মজার ঘর থেকেই বের হতে দেখেছেন?’

রমিজ আলী দৃষ্টি অস্থির রেখে আমতা আমতা শুরু করলেন। দম নিয়ে বললেন,’তারে বারান্দা থাইকা বাইর হইতে দেখছি।’

মজিদ মাতব্বর নীরব থেকে এরপর বললেন,’তাহলে কোন আন্দাজে আপনি বলছেন,তারা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত ছিল?’

পদ্মজার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। সে চোখ বুজে ফেলল। রমিজ আলী

থমকে গিয়ে পরপরই হুংকার দিয়ে উঠেন,’একটা অচেনা ছেড়া খালি বাড়িত কোনো ছেড়ির কাছে কেন যাইব? আপনার নিজের ছেড়া বলে,তার দোষ ঢাকতে পারেন না। আমার ছেড়ির বেলা কিন্তু ছাড়েন নাই।’

‘যুক্তি দিয়ে কথা বলুন। আপনার মেয়েকে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। তার গায়ে কাপড় ছিল না। তারা একসাথে একই ঘরের একই বিছানায় ধরা পড়েছে। আমির আর পদ্মজার বেলা সেটা হয়নি।’

মজিদ মাতব্বরের ক্ষমতা এবং কথার দাপটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে রমিজ আলীর। কামরুল চুপসে গিয়েছেন। সামনে নির্বাচন। মজিদ মাতব্বরকে ক্ষেপানো মানে নিজের কপালে দুঃখ বয়ে আনা। ভীরের মাঝ থেকে কেউ একজন বলল,'তাহলে আপনার ছেলে একটা মেয়ের কাছে খালি বাড়িতে গেল কেন?'

মজিদ মাতব্বর উঁকি দিয়ে প্রশ্নদাতাকে খুঁজে বের করলেন। তারই প্রতিপক্ষ হারুন রশীদ! মজিদ মাতব্বর আমিরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন

করলেন,’তুমি কেন গিয়েছিলে পদ্মজার বাড়িতে?’

আমির সহজ গলায় বলল,’বাড়ি ফিরছিলাম হঠাৎ ঝড় শুরু হলো। সামনে মোর্শেদ কাকার বাড়ি ছিল। মোর্শেদ কাকা বাড়ি নাই জানতাম না। জানলে,বৃষ্টিতে ভিজতাম। তবুও ওই বাড়ি যেতাম না। এই গ্রামের অনেকেই জানে আমার শ্বাসকষ্ট আছে। বাড়ির সবাই জানে,বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগে। শ্বাসকষ্ট হয়।’

হারুন রশীদ বললেন,’যখন দেখলা ছেড়িডা বাড়িত একলা তখন বাইর হইয়া গেলা না ক্যান?’

আমির সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,’আমার মাথায় আসেনি এমন কিছু হতে পারে। আর... ”
আমির পদ্মজার দিকে একবার তাকাল। পদ্মজা সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল। আমির বলল,’আর...পদ্মজা কতটা সুন্দর যারা দেখেছে সবাই জানে। আমি প্রথম দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। তাই মস্তিষ্কে একবারো কোনো বিপদের আশঙ্কা আসেনি।’

মজিদ মাতব্বর ছেলের শেষ কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। তবুও স্বাভাবিক থেকেই বললেন,’গ্রামবাসী কোনো

প্রমাণ ছাড়াই লাফিয়েছে। মেয়েটাকে অপদস্থ করেছে। প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে নোংরামো অপবাদ দেয়া অপরাধ।’

মজিদ মাতব্বর কামরুলের দিকে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললেন,’ছইদ,মজনুর ছেলে আরেকটা কে জানি? কোথায় তারা?’

কামরুল ধীরভাবে বলল,’পাই নাই খোঁজে। মনে হয়, ভয়ে কোনহানো লুকাইছে।’

রমিজ আলী হঠাৎ গমগম করে উঠলেন,’এইডা আমি মানি না। তারারে আপনে ছাইড়া দিতে পারেন না।

আপনের ক্ষমতা বেশি দেইখা আপনে এমনে নিজের ছেড়ারে ঢাইকা রাখতে পারেন না। ধূর্তবাজ লোক।’

আমির রেগেমেগে রমিজ আলীকে ধরতে এলে, মজিদ গর্জন করে উঠলেন,’আমির!’

আমির কিড়মিড় করে রাগ হজম করার চেষ্টা করল। হারুন অতিশয় ধূর্ত লোক। তিনি রসিকতা করে বললেন,’সত্য হউক আর মিথ্যাই। বদনাম তো বদনামই।’

মজিদ সবার প্রশ্ন কথা উপেক্ষা করে উপস্থিত গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে

বললেন,’আপনাদের আমার বিচারের প্রতি বিশ্বাস আছে?’

সবাই আওয়াজ করে বলল,’আছে।’

মজিদ মাতব্বর তৃপ্তির সাথে হাসলেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কণ্ঠ উঁচু করে বললেন,’মোর্শেদের মেয়েদের সাথে খারাপ হয়েছে। পদ্মজার নামে অনেক প্রশংসা শুনেছি। সে খুবই ভাল মেয়ে। আর আমার ছেলেকেও সবাই চিনেন, সে কেমন। যারা যারা দোষ করেছে তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়া হবে। পদ্মজা আর আমির নামে যে পাপের অভিযোগ করা হয়েছে তার যুক্তিগত

প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ছাড়া আমি কখনো কাউকে শাস্তি দেইনি। আজও দেব না। তবে আমি আজ সবার সামনে মোর্শেদ আর তার স্ত্রীর কাছে একটা প্রস্তাব রাখব।’

হেমলতা, মোর্শেদ সহ উপস্থিত সবাই কৌতূহল নিয়ে তাকাল। মজিদ মাতব্বর বললেন,’পদ্মজাকে আমিরের বউ করে নিয়ে যেতে চাই।’

চারিদিকে কোলাহল বেড়ে গেল। সব কোলাহল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু মজিদ মাতব্বরের প্রস্তাবটি পদ্মজার কানে বাজতে

থাকল। জীবনের কোন মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে?

চলবে....